‘আর কী দ্যাখো তুমি’

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

[১৯৮৮-র ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বর্তমান লেখক দু'টি বক্তৃতা দেন। বিষয়: ‘আধুনিক বাংলা কবিতার চিত্রকল্প: পঞ্চাশ দশকের তিন বিতর্কিত কবি।’ তাঁর প্রথম দিনের বক্তৃতাটি প্রধানত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা-সম্পর্কিত। এবং দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ উৎপলকুমার বসুর কবিতা। এখানে দ্বিতীয়টিই পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হল। কথ্য থেকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরের জন্য এবং মুদ্রণ পারিপাট্যের স্বার্থে সামান্য পরিমার্জনা করা হয়েছে। এই ভাষণে উল্লিখিত কবিতাংশের জন্য ‘উৎপলকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (প্রকাশক: প্রতিভাস) এবং গদ্যাংশের জন্য ‘ধূসর আতাগাছ’ (প্রকাশক: কৌরব) দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক]

□ ১ □

‘আর কী দ্যাখো তুমি— নিজেকে আমি প্রশ্ন করি, দেখি পাখির ধড়, তারপর মাথা, তারপর চোখ, দেখি এই সাহিত্য জন্মে উঠেছে বাস্তব থেকে এবং এখন নেড়ে-চেড়ে দেখছে জাতকের রক্তমাখা কাপড়-তুলো-ব্যান্ডেজ, এবং এ-ও সত্য যে, যে-হাসপাতালে

সে জন্মেছিল সেখানেই— তাকে ফিরে যেতে হবে মরণোন্মুখ মানুষ হিসেবে, না এটি সত্যি নয়, রিয়ালিটি, তাই অধিকতর আকর্ষণীয়, যখন আমি পাখিটার চোখ দেখি তখন, কেবলমাত্র তখনই, তার রিয়ালিটিকে দেখি, এবং রিয়ালিটি কী এ-প্রশ্নের জবাবে আমি ৺জগদীশ রায়কে স্মরণ করি, যিনি ছিলেন আমার স্কুলের বন্ধু দীননাথ ওরফে দীনে-র বাবা, দীনে ছিলো বুদ্ধিতে খাটো যেমন ছিলেন তার বাবা জগদীশবাবু চেহারায় খাটো, আমি ওদের বাড়িতে প্রায়ই যেতুম, দেখতাম বেশ হৈ চৈ খাওয়াদাওয়া চলছে, দীনের মাসি-পিসি-মাসির ননদাই-পিসিস ভাসুরে বেশ জমজমাট সংসার, কেবল মা সগ্‌গে গেছেন, দীননাথের লিমিটেড আবেগ এর বেশি আর কিছু বলতে পারত না, আর ওর বাবা আসতেন সমস্ত হৈ চৈ মিটে যাবার পর, বারান্দার এককোণে, প্রায় অচ্ছুতের মতো প্রায়ান্ধকারে আসন ও জলের গেলাস নিয়ে বসতেন কেননা উনি ছিলেন ঘোড়ার সইস, রেসের মাঠে ঘোড়া দৌড়ুতেন, তাই বাড়ির টাটা-আই. সি. আই-চাটার্ড ব্যাঙ্ক-পোর্ট কমিশন-মহিলারা ওঁকে একটু আড়ালে আবডালে রাখতেন, সেই জগদীশবাবু আমাদের শোনাতে ভালোবাসতেন তাঁর বিশ্বজয়ের কাহিনী, যখন আমরা একা থাকতুম, আমাদের একা পেলেই তিনি তাজ হোটেলের সায়েব-বেয়ারাকে কি ভাবে আঙুলের তুড়ি দিয়ে ডেকেছিলেন বা খিলনমার্গের পথে বরফে-আটকে-পড়া এক অশ্বারোহিণীকে তিনি কি ভাবে উদ্ধার করেছিলেন-জাতীয় কাহিনী শোনাতেন— আর শোনাতেন অত্যাশ্চর্য খাওয়ার গল্প, সৌদে নাকি তার সম্মানে যে নৈশভোজের আয়োজন হয়েছিল সেখানে ছিল রোস্ট উট, তার পেটের ভিতর রোস্ট গাধা, তার পেটের ভিতর ভেড়া, তার পেটের ভিতর তিতির পাখি এবং গল্প শেষে আমাদের হাতে কিছু খুচরো গুজে দিয়ে বলতেন দৌড়ে স্বারিকে চলে যা, লুচি আর ছোলার ডাল নিয়ে আয়, সেই জগদীশবাবুর ছেলে, আমার প্রাণের বন্ধু দীননাথ একদিন ফুটপাথের রেলিঙে কুঁজো হয়ে বসে, পা দোলাতে দোলাতে বল্লে কিনা তার বাবার গল্পগুলো নাকি ফ্যান্টাসি, যদি তা না হ'ত— আমি প্রশ্ন করি, তাতে দীননাথ বিন্দুমাত্রও ঘাবড়ে না গিয়ে উত্তর দেয় তাহলে ওগুলো হ'ত রিয়ালিটি।

হাঁ, সেই প্রথম আমি রিয়ালিটি শব্দটির সংস্পর্শে আসি, নেগেটিভ সূত্রে, এবং তারপর থেকে সে আমার পিছু ছাড়েনি।...'

('ধূসর আতাগাছ')।

না, এই দীর্ঘ, আপত্তিকররূপে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি কোনো গল্পচ্ছলে তৈরি-করা হয়নি। যা-হয়েছে তা কেবল আমাদের সমবয়সী এক বিশিষ্ট কবিবন্ধুর প্রার্থিত শিল্পতত্ত্ব। ঐ রচনা থেকে আমরা জানতে পারছি এক আমেরিকান লেখিকা তাঁর ১৯২৬ সালের কেম্ব্রিজ সাহিত্যবক্তৃতায় বলেন কম্পোজিশনের কথা। সমগ্রকে দেখতে, এই কম্পোজিশনই তার 'একমাত্র স্বীকারযোগ্য এক্সপ্লানেশন'। অতএব এই প্রস্তাবিত তত্ত্বের উপস্থাপনায়, অগত্যা, কবি উৎপলকুমার বসু এক সইস জগদীশ রায়কে দাঁড়

করান। তাঁর সামাজিক অস্তিত্বের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা নিঙরে-নিঙরে দেখান। তাঁর গল্প বলার ধরন ও বিষয়ের ফ্যান্টাসি থেকে রিয়ালিটির দিকে— পাখির ধড় নয়, তার চোখটিকেই দেখতে পেয়েছেন যেন, এইভাবে, বহু-কৌণিক দেখার ফ্র্যাগ্‌মেন্টেশন বা খণ্ডতায়, অবশেষে উৎপল সমগ্রের কম্পোজিশন যা হোক টের পেয়ে যান। তাহলে, সইস জগদীশের অভিজ্ঞতার গল্প— গল্প নয় ফ্যান্টাসি। আবার ফ্যান্টাসি যদি না হয়, তবে তা-ই রিয়ালিটি। যেহেতু স্বয়ং জগদীশও একটি কম্পোজিশন। এইরকম, মৌলালীর মোড়ে, মনপসন্দ্ অন্য এক হেকিমি-ইউনানি পাশ স্বপ্নাদ্য ওষুধবিক্রেতা, যখন স্বপ্নরহস্য ও জীবনে তার প্রয়োগ বিষয়ে বলে, বলছে মনের অসুখের কথা, মন ও শরীরের দার্শনিক সম্পর্ক, ঠিক তখনই— তার থলি থেকে বেরোয় সেই 'বাস্তবরূপী একটা খড়পোরা শেয়ালের চামড়া'। নেতি নেতি ক'রে যা নিশ্চিতই এমন এক বাস্তবে এসে পৌঁছয়, যেখানে সে-খোড়ো খ্যাঁকশেয়ালটি সত্য না হলেও বাস্তব। উপপাদ্য (খ্যাঁকশেয়াল) আর সম্পাদ্যে (স্বপ্নাদ্য ওষুধ) আপাতত যোগাযোগরহিত সে-অসম্ভবে— বাস্তবতার সামগ্রিক কম্পোজিশন ও তার সমস্ত অনুপুঙ্খ উপাদানসমেত, যোজনা করে পরম্পর 'আলোছায়াময় সম্পর্ক'। এমন সম্পর্কের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে একবার উৎপলকুমার বসু লেখেন: 'এই সম্পর্ক বা রিলেশনশিপ সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন না থাকলে লেখালেখির চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র।' এখন, 'সম্পর্ক' বলতে যে তথাকথিত আমাদের 'নিয়মানুবর্তী' সম্পর্কের কথাই ভাবতে হয়, যেহেতু এখনও— উৎপলের কথায়, আমরা সেই 'আত্মপ্রত্যয়ী মুহূর্তে' এসে পড়তে ইতস্তত করছি। অথচ কম্পোজিশন ও তার ভিতরের তাবৎ খণ্ডীকরণের মূলে, এই সম্পর্ক। যা আপাত-নিঃসম্পর্কীয় বলে মনে হলেও, একের পর এক— ঝড়ের রাতে কুড়িয়ে পাওয়া নানারঙের 'এলোমেলো পাথর' রঙ মিলিয়ে আলাদা আলাদা বাক্সে না রেখে, উৎপলের দেখা একটি ছোট মেয়ে যেমন চেয়েছিল তা একত্রেই তুলে রাখতে। নিশ্চয় তাদের একত্রীকরণই শুধু 'সম্পর্ক' নয়। বরং তার ক্রমাগত অন্বয়ে ও অনন্বয়ে যে টেনশন অনিবার্য, এ স্থলে, অনিয়মিত বলে ভুল করলেও তা-ই প্রকৃত সম্পর্ক। ব্যবহারিক জীবন ও শিল্পীত জীবনময়তা যে-অর্থে একই সঙ্গে অন্বয় ও অনন্বয়েরই টেনশনজাত বহুমাত্রিক বিচ্ছেদ-রেখা। যা বহুর ভিতর দিয়েও একটি মিলনবিন্দু খুঁজে বের করতে চাইবে। চাইবে, কারণ ছোট ও পরিচিত সম্পর্কগুলি ভেঙে দিতে দিতেই আসে বড় ও অনিয়মিত সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদ। অতএব, সে-কাজও শুরু হয়ে গেছে কবেই।

'অফিসের চারদিকে এক একদিন প্রবল কুয়াশা নামে। জানালার পাশেই আমার টেবিল। আমার ফাইলের তাকটা সেবার কুয়াশার ভিতর ভেঙে পড়ল। কারো দোষ নেই। আমি বড়বাবুকে গিয়ে বললুম ওটা তো ভাঙবেই, কেরোসিন কাঠের তক্তা। উনি হাসতে হাসতে বললেন: কেরোসিন কাঠ আবার কি, বলুন পাইন কাঠ। কুয়াশা এবং ঐ ভেঙেপড়া পাইন গাছ দেখে বাহাদুর তার গ্রামের গল্প

সুব্রু করে : সেবারে পাহাড়ে কোনো ফসল নেই খুব ঠাণ্ডা পড়ল দেওয়ালির রাতে...'

(ধূসর আতাগাছ)

কবি উৎপলকুমার বসু প্রদত্ত সম্পর্কের এই শেষ উদাহরণে, হঠাৎ কুয়াশা ও অফিস-টেবিলের কেমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা-সবসময়ই আমাদের অচেনা, সুতরাং অনিয়মিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নঞর্থক সে-বিচ্ছেদরেখা ধরেই কুয়াশার ভিতর অফিসের ফাইল-রাখবার তাকটি ভেঙে পড়ে ; যেহেতু তা কেরোসিন কাঠের তক্তা, কেরোসিন কাঠ নয় পাইন কাঠ— পাইন, কুয়াশায় আস্ত একটি পাইন গাছই তবে সম্পূর্ণ করে দেখায় সে-ভেঙে পড়ার কম্পোজিশন! আর এইখান থেকেই আমাদের তাবৎ গল্প বলার আরম্ভ। গল্প ? না ফ্যান্টাসি ? 'যদি তা না হতো—' নিশ্চয় গল্প ভেঙে দিয়ে আমরাও এই প্রশ্ন করি। আর উত্তরটিও পেয়ে যাই মনে মনে, 'তাহলে ওগুলো হতো রিয়ালিটি।'

উৎপলকুমার বসুর 'ধূসর আতাগাছ' নামক রচনাটির উল্লেখ করে এই যে আমি আমার বক্তব্যের উপস্থাপনা করতে চাইছি, তাতে আপাতত এই-একটা অসুবিধে হওয়ার কথা, তা হল, উক্ত রচনাটি যেহেতু অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত ও কম প্রচারিত লিটল্ ম্যাগাজিনে প্রকাশ পেয়েছিল, তাই সে-রচনা বিষয়ে আপনারা হয়তো অনেকেই অনবহিত। অথচ সে-লেখাটি এমন যে তার প্রত্যেকটি পঙক্তি বা পদের সঙ্গে পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে না থাকলে, এ-সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি তাঁর কাব্যরচনা বিষয়ে যে-শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় আসছেন তা ঠিকমতো জানা যাবে না। উপস্থিত বক্তৃতায় এই ত্রুটি আমি সবিনয়েই স্বীকার করছি। স্বীকার করছি কিন্তু প্রসঙ্গটি উল্লেখ ব্যাপারে ক্ষান্ত হচ্ছি না, কারণ, কবি যখন নিজের লেখালেখির সূত্রে এই জাতীয় শিল্পতত্ত্বের উত্থাপন করেন, তখন কবির রচনাধারারই শুদ্ধ নয়— তাঁর সমকালীন কাব্যাদর্শেরও একটা পরিচয় তাতে পরিস্ফুট হওয়ার কথা। কখনো, কবিদের চিঠিপত্র যে অর্থে তাঁদের রচনাপ্রকৃতির গোপন তথ্যসূত্র, এস্থলে, 'ধূসর আতাগাছ'-নামধেয় রচনাটি, ততটাই প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গোত্রীয় নয় নিশ্চয়। তবু যে-ধরনের লেখা লিখে ফরাসি প্রতীকবাদীদের পথিকৃৎ বোদলেয়ারকেও খুলে দেখাতে হয়েছিল প্যারিসের প্লীহা, আর অন্ধকারকে মনে হয়েছিল আলোর বেশি, এক বাঙালি কবির ধূসর আতাগাছও তেমনি ধূসরতর হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে তার লৌকিক তোতাপাখিটির জ্বলজ্বলে চোখটুকুই স্মৃতিচ্ছন্ন করে। যা-দিয়ে, সমগ্রের বস্তুনিরীক্ষায় পাখির ধড় নয়, তার চোখ-দেখার কেন্দ্রবিন্দুটিই যা-হোক আমরা শেষ অব্দি চিনে নিতে পারি। বস্তু বা ব্যক্তি উপাদানের বিন্যাসগত খণ্ডীকরণের ও তার কেন্দ্রবিন্দু নির্ণয়েই যে-সমগ্রের বাস্তবতা পায় প্রতীকোৎসারিতা, অন্তত এটুকুর জন্যও চাই তো একটি ধূসর আতাগাছ, যার ডালে বসে অনেকদিনের তোতাপাখিটি।

□ ২ □

এবারে আরো-একটু ভেঙে বলি।

বাংলা কবিতার— যে-সময়টিকে আমি বলছি সেটা ১৯৫০-এর সময়কার একটা বিশেষ অবস্থা। আজ তার আটত্রিশ বছর পরে, পেছনে তাকিয়ে, সমস্তটাই দেখতে পাচ্ছি। দেখছি সেইসব কবিদেরই, যাঁরা, তাঁদের বয়ঃসীমায়— সকলেই এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে। এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হিসেবে আমি বলেছি আপাতত তিন-জনের নাম— যাঁদের একজন অবশ্যই উৎপলকুমার বসু। এবং অন্য দুজন— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। স্বীকার করাই ভালো, শেষোক্ত দুজন যতটা তাঁদের শক্তিমত্তায় ও প্রচারকৌশলে আজ পরিচিত কবি, প্রথমোক্তকে ততটাই অপরিচিত বলতে হয়, অন্তত, সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে।

কিন্তু সে যাই হোক, আমার বক্তব্য : এই নির্বাচন এঁদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়। আর সে-রকম ঝুঁকি আমরা নেবই বা কেন। বরং যদি বলি— একটাই অখণ্ড প্রবাহের ভিতর থেকে লক্ষ্যগোচর এই তিনটি বিতর্কিত ঝোঁক, বাংলা কবিতা ও কবিদের অতি-সাম্প্রতিকেও কমবেশি স্পর্শকাতরতার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর এই উপলক্ষে, প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও তুলছি না। শুধু দেখতে চাইছি, এই তিন ধরনের ঝোঁকের প্রতি ইদানীংকার কবিদের গ্রহণ-বর্জনের প্রবণতায় সেই ত্রয়ীর গোপন ভূমিকা। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তিন তারার বদলে পাঁচ কি সাত নক্ষত্রের দিকেই যাচ্ছি না এখনো। সপ্রতিভ ও ভাস্কর সে-নক্ষত্রগুলির থেকে, কেনই বা বেছে নেব না অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষের নাম, এবং আলোক সরকার ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর মতো কবিকে ? এবং বিনয় মজুমদারকে ? হয়তো এই কারণে যে এঁরা সকলেই নিজের নিজের পরিধিতে শীর্ষস্থানীয় হলেও আলাদা করে কোনো নতুন বিতর্কের ঝোঁক সৃষ্টি করেন না পরবর্তী কবিদের মধ্যে। যা করেছেন, তা ঐ পূর্বোক্ত প্রধান তিনটি ঝোঁকেরই স্বপক্ষীয় পুষ্টিসাধন। সেখানে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য তর্কাতীত এবং অবদান নিঃসংশয়েই শ্রদ্ধেয়। আমি হয়তো অন্যত্র, স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্নতর প্রসঙ্গে, এঁদের প্রত্যেকের কবিকৃতি সম্পর্কে বলব। পঞ্চাশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হিসেবে এঁরা কেউই কারুর চাইতে কম নন। স্বকীয়তা এঁদের রচনাপ্রকৃতিকে, একজনের থেকে অন্যজনকে অবশ্যই কোনো-না-কোনো ভাবে বিশিষ্ট করে। যেমন, অলোকরঞ্জনের কল্পনা-প্রতিভার বহুমুখিনতা ও শব্দব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও দেখি তাঁর আবিশ্ব মানুষ এখনো দূরান্বয়ী ; অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষের সামাজিক সুসমাচারের প্রত্যাশায় আত্মগত মিতকথন যে-ভাষায়, ছন্দে আপাত-নিরলংকৃত নিঃশব্দের সর্বদিকেই খুঁজে ফেরে এক-একটি কথামুখ— তা এখনো, সহজেরই রসে সঞ্জীবিত বলে গ্রাহ্য। গ্রাহ্য— কিন্তু বিতর্কিত নয়। আবার, আলোক সরকারের শুদ্ধ কবিতার ধারাবাহিক স্বরবৃত্তও তেমনি প্রতীকনির্ভর। যে-প্রতীক অনুষঙ্গের বিচিত্রতায় না-গিয়ে কেবলই ফিরে আসে তাঁর আত্মমগ্নতায়। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কবিতাকে সচেতন-ভাবে ভারমুক্ত করার জন্যই তৈরি থাকেন আজও। আজও কবির ব্যাপক দায়বদ্ধতাকে তিনি একমুখী নিচুস্বরের আত্মস্থতায় নিয়ে আসতে চান এবং বিনয় মজুমদারের আযৌন

শব্দবিবাহে যে সরল ও অকপট উচ্চারণধারা আজও পয়ারপ্রতিম, তা-ও, এক-একটা স্বকৃত উত্তর মেলানো অক্ষেরই অনুবর্তী, তর্কে'র স্বতন্ত্র ঝোঁক সেখানেও অনুপস্থিত। অবশ্য এ'দের নিজের নিজের সফলতার ও শক্তিমত্তার পরিমাপে বাংলা কবিতা এ-পর্যন্ত সমৃদ্ধই হয়েছে, সন্দেহ নেই। কম হোক বেশি হোক, এ'রা সকলেই সমাদৃত কবি। এ'দের নিয়ে সুধী পাঠকসমাজে, বা কবিমণ্ডলীতে, এখনো অন্দি কোনো বড় ধরনের বিতর্ক গড়ে ওঠেনি। সেটা কবি-বিশেষের পক্ষে সুলক্ষণ না দুর্লক্ষণ, এমনকি তাতে করে এইসব কবিদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কিছুটা খর্ব হয়ে যাচ্ছে কিনা— তেমন বিচার-বিবেচনায় না গিয়ে— ফের সেই তিনজন বিতর্কিত কবি-বিষয়েই মনোনিবেশ রাখি। যেহেতু, বিতর্কিত এই ত্রয়ীই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিমতে এখনো trend-setter হয়ে আছেন আজকের বাংলা কবিতায়।

অতএব, এই আলোচনার গোড়াতেই যে উৎপলকুমার বসুর শিল্পতত্ত্ব-সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুসরণ করেছি— আপাতত তারই রেশ ধরে ফের শুরু করি। এই আরম্ভ উপস্থিত বক্তৃতার একরকম উপসংহারও বটে।

□ ৩ □

রিয়ালিটি আর তার দ্বান্দ্বিক সমাজসম্পর্ক বা রিলেশনশিপের সূত্রেই তবে ইমেজিস্ট্-দের ব্যবহৃত আতসকাচে শ্লেষবিদ্ধ আর তির্যক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে আজ কালবেলা — যা পুরোপুরিই বিশ শতকীয় এক বিরাট কম্পোজিশন। তাহলে পাখির ধড়টাই দেখব, না শুধু চোখ— সেই তর্কে, আপাতত সুস্থির ও অতিক্রান্ত আমরা, জানি, জেনেছি, তার—আদি প্রেরণাসূত্রের উৎসস্বরূপ সে উনিশ শতকীয় ফরাসি সিম্বলিজম। স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিচ্ছায়ায়, পাখির নয়, মাছের চোখ লক্ষ করে তীর-ছোঁড়ার সেই মহাভারতীয় কৌশল— কত কাল পরে, আরেকবার, আমাদের মনে পড়ে। পর্যবেক্ষণ-শক্তির এই আকে'টাইপ, অতঃপর, কত ঘাট পেরিয়ে, বস্তু ও বস্তুসত্তার বিভেদজনিত চূড়ান্ত সোরগোলের মুহূর্তেই, হয়ে ওঠে আরো আধুনিক শিল্পতত্ত্ব। আর সেই হাতেনাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার আধুনিক শিক্ষাটা আসে কিনা অগত্যা ফরাসি সিম্বলিস্ট্দেরই কাছ থেকে। সুতরাং ফরাসি সিম্বলিস্ট্ আর ইঙ্গ-মার্কিনী ইমেজিস্ট্দের উনিশ-বিশ— সেই সার্থক উত্তরাধিকার— আমাদের তিরিশের বাংলা কবিতায়। এবং একচুলও স্থানান্তরিত না হয়ে, পাঁচের দশকের প্রধান কবিসমাজও, বহিরাশ্রয়িতার সে অনুদিত মূলধনে বিনিয়োগ করেন তাঁদের অধ্যবসায়। এমনকি পূর্বসূরীদের নিরন্তর রবীন্দ্রমনস্কতাই যে দেশীয় ঐতিহ্যের সংলগ্নতা— সেই ঐতিহ্যেরও সাময়িক-পরিবর্জন এবং ক্রমে তার পরিগ্রহণও তাঁদের অবচেতনের অনুধ্যেয় বিষয় হয়ে ওঠে।

দেখার ধরনটা পাল্টে দেওয়াই তো সেই স্থিরতর বিন্দুর সমীপবর্তী হওয়ার প্রথম শর্ত। আক্ষরিক বর্ণনার বদলে, বস্তুকে নির্বস্তুক বিমূর্ততার উদ্ভাসে নিয়ে

আসা— এই তো চেয়েছিলেন প্রতীকবাদীরা। তথাকথিত ইমেজিস্ট্ বা চিত্রকল্প-বাদীরাও তাই চাইলেন। সব প্রতীকই একেক ধরনের চিত্রকল্প। যদিও যে-কোনো চিত্রকল্পই প্রতীক নয়। অবশ্য বস্তুত্ব প্রতিপাদনের জন্য, এলিয়ট বলেছেন, আমাদের স্মৃতিচ্ছন্ন বিশেষ-বিশেষ বস্তুর মূল্যবোধই তার প্রতীকিতার সারাৎসার। ফলত, আরো অব্যক্ত অনুভূতিস্তরে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই 'অব্যক্ত অনুভূতিটি'ই বিশেষ অনুভূতি : যার 'objective correlative' বা 'উদ্দীপন বিভাব'টি হল এলিয়টের কথায়, 'a set of objects, a situation, a chain of events'। যেমন, উৎপলের আলোচনায় কম্পোজিশন ও তার রিলেশনশিপের উদাহরণে (দ্র. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি), আপিশের চারপাশে হঠাৎ কুয়াশা নামে, কুয়াশার ভিতর ভেঙে পড়ে ফাইলের তাক। সম্ভবত কেরোসিন কাঠের তক্তা। কেরোসিন কাঠ কি—আসলে পাইন কাঠ। এইভাবে কুয়াশার সঙ্গে পাইন মিশে আস্ত একটি পাইন গাছই তার পাহাড়সদৃশ প্রতীয়মান হয়ে ওঠে সেই আপিশের বাহাদুরের মনে। বাস্তবতায় এই সম্পর্কযোজনার সূত্র তবে ইমেজিস্ট্দেরই ধরন, আরো ব্যাপক অর্থে বললে— প্রতীকবাদী পন্থারই সমগোত্রীয় নিশ্চয়। উৎপল এখানে যার স্কেচটুকুই আমাদের দেখিয়ে দেন।

□ ৪ □

এরপর তাঁর একটি কবিতাই আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। আমরা সেখানে দেখব এক রূপান্তরিত বাস্তব ও তার মাত্রান্তরের পর্যায়গুলি। কবিতাটির নাম 'ময়ূর'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা' (১৯৬১) থেকে এটি সংগৃহীত হচ্ছে হয়তো এই প্রমাণের জন্য যে, কবির নিজের লেখালেখির তত্ত্বভাবনা কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়। তার মূল, খুব কম করে হলেও বছর কুড়ির ভাবনাতাড়িত। সুতরাং, সমুদ্রবিষয়ক একটি কবিতার নাম কেন ময়ূর— আপাতত সেই প্রশ্নেরই অন্তর্গত রহস্যে, আমরা প্রথমেই তার ইমেজ বা চিত্রকল্প বা বাক্প্রতিমার প্রকৃতিটি অন্বধাবন করতে চাই। কবিতাটি এই :

ময়ূর

ময়ূর, বুঝি বা কোনো সূর্যাস্তে জন্মেছ।
এবং মেঘের তলে উল্লাসে নতুন ডানাটিকে মেলে ধরে
যখন প্রথম খেলা শুরু হবে— সেই স্থির পরকালে
আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি ময়ূর।

সমুদ্রসৈকত ধরে এত দূর, এত গাঢ় স্তব্ধতার কাছে এসে
তোমার প্রবল দৌড় দেখা গেল, যেন
আরো শব্দহীনতার প্রতি— অন্ধকার ঝাউবনে— অস্তিত্ব জটিল

আমাদের আর্তরবে ডেকেছ সহসা।

সেদিন বনের শেষে নির্বসন যৌবনের চোখে
বিদ্যুৎ চমক বলে মনে হলো তোমার প্রতিভা
মনে হল নবীন নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি
এইভাবে ক্রমাগত অন্তহীনতার বুকে মিশে যায়।

ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
আমি তার ভেঙে পড়া দেখেছি গর্জনে। দেখেছি আছাড়
ডুবন্ত জাহাজ থেকে ভেঙে নেয় পাটাতন, জয়ের মাস্তুল।

তবুও ঝড়ের শেষে, তবুও দিনের শেষে, অন্ধকার বনে
বৃষ্টির মেঘের তলে শোনা গেল আর্ত কেকারব
বুঝি নির্জনতা পেয়ে পুনর্বার মেলেছ বিশাল
নক্ষত্রে সাজানো ডানা। পেয়েছ নির্দেশ ?

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

সমুদ্রতীরে সূর্যাস্ত— এই প্রচলিত কবিত্বলোভন বিষয়টিকে প্রথমেই ভেঙে দিলেন উৎপলকুমার বসু। 'অস্তিত্ব জটিল আমাদের আর্তরবে ডেকেছে সহসা'— সমুদ্রের পরিবর্তে, একটি পেখমছড়ানো ময়ূরের ডাক— যেন মানুষের অন্তরাত্মাই ডেকে উঠেছে সহসা। অরণ্যচর ময়ূর ও সামায়িক সমুদ্রবাসী, তথা চিরবিরহী মানুষের এই একাত্মীকরণই আপাতত এ-রচনার মোটিফ চিত্রকল্প। যে বিরাট কম্পোজিশন তিনি মনস্থ করেন, হয়তো তারই প্রতি নিবিড় ঔৎসুক্যে— কবি যেন সেই সমগ্রের প্রত্যেকটি এলিমেন্টের ভিতর থেকেই বের করে আনেন এক 'আলোছায়াময় সম্পর্ক'। তাই সূর্যাস্ত। নরম আলোছায়াময়তারই যেন জাতক সে, জন্মমাত্রেই বিশাল ডানাদুটি মেলে সেই 'স্থির পরকালে' তার 'প্রথম খেলা সুরু হবে' বলে— দিনশেষের এই এক দৃশ্যজাত উদ্দীপনার সূত্রপাত ঘটায়। কবির কাছে নীল আকাশ ও সমুদ্রের রঙ স্পষ্ট ও একীকৃত যেন। তাকেই ফিকেনীল আর আবছা করে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেন সম্ভবত গাঢ় মেঘরঙের আড়াল। এইভাবে ময়ূর দেখা দেয়। খুবই সাধারণ চিত্রকল্প। কিন্তু প্রয়োগ বিশেষত্বে— তা আর ইহকালের সমুদ্রআকাশ নয়, যথার্থই ময়ূর হয়ে গেছে বুঝি। এই যে ইম্প্রেশনিস্টিক্ দৃশ্যকল্প ইমেজ, যা অনায়াসেই এক প্রতীকী চিত্রকল্প হয়ে ওঠে— সমুদ্রতীরে তারই 'প্রবল দৌড়' প্রবলতর তরঙ্গোচ্ছ্বাস —'আমাদের আর্তরবে' প্রতিধ্বনিত। কবিতাটির শেষ তিনটি স্তবক, রচনাটির যেন দ্বিতীয় ভাগ। যে-ময়ূর এ-মুহূর্তে সৃষ্টিশীলতার প্রতীক : 'নবীনতমা সৃষ্টির ক্ষমতাও বুঝি'— তাকে অনন্তে বিলীয়মান বলেও যদি ভাবি, তবে অস্তায়মান 'দিনের শেষে,

অন্ধকার বনে / বৃষ্টির মেঘের তলে' তার 'প্রতিভা'র বিদ্যুচ্চমকও এক 'নির্দেশের অপেক্ষায়। সে কোন্ 'নির্দেশ ?' 'আর্ত ককেরাব' আর 'ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে / 'অস্তিত্ব'কে ফিরে দাও'— এই চিৎকারের নিঃশব্দ প্রচণ্ডতার অভিব্যক্তি, উভয়তই তবে সমুদ্রকে ময়ূরক্রমে তার ধাবনশীলতার প্রতি নিয়ত সৃষ্টিশীল বলে মনে করে। 'অস্তিত্ব'-কে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনায় কবি তাই সৃষ্টিক্ষমতাকে শব্দহীনতার প্রতি এক সময়োচিত আক্রমণ বলে জানেন।

দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি দৃশ্যকল্প ইমেজকে ছুঁয়েই কবিতার অন্তর্গত আর্তিটুকু এক ট্রাজিক কম্পোজিশনের রূপ ধরেছে অর্থাৎ বিন্যাসের সেই ট্রাজিক অংশটিই এ-রচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু— যাকে বলেছি এই কবিতার মোটিফ্ বা প্রতীকীচিত্রকল্প।

উৎপলের প্রথমদিকের লেখায় কবিতার বিষয়-হয়ে-ওঠা এমনি রূপান্তরের প্রধানত অনুষঙ্গনির্ভর চাপা আবেগধর্ম, তখন সবে, একটু-আধটু অনিয়মিত ছন্দো-যতির প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে। 'আমি প্রথম তোমার দেখা পেয়েছি ময়ূরে'— পয়ারজাতীয় ছন্দে 'আমি' নামক এমন অস্ফুট অতিপর্ব-যোজনা দিয়েই, কালক্রমে, তাঁর পরবর্তী নিচুস্বরের 'পরকালে' তিনি এসে পড়েন। 'ময়ূর' কবিতাটির তাৎপর্যের ও উৎপলের 'পুরীসিরিজ'-এর সুনিশ্চিত পূর্বাভাস আছে। উচ্চারণকে মাঝেমাঝেই বিবৃতমাত্রিক করে-তোলা তাঁর পরবর্তী পয়ার-প্রবণতার একটি নিয়মিত অভ্যাস। যার সূচনা তাঁর রচনায় প্রথমাবধিই লক্ষণীয়। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে tonal variation-এর এই জীবনানন্দীয় উত্তরাধিকার, একমাত্র উৎপলই সঠিক কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র বইয়ে, কবির যৌবনদিন চচ্চড় শব্দে ফেটে-পড়া কার্পাস কি শিমুলেরই আঁশ নয় শুধু। বরং এই বলেন :

> 'আমার চেতনা শুধু শব্দের করস্পর্শে ভেঙে যায়।
> অথবা তাকেই আমি খুঁড়ে ফেলি, যেন উদ্বেলিত
> ছায়া-গন্ধ-ঝরা গাছ খুঁড়ে ফেলে, বীজের আশায়
> সূর্যের আন্দোলনে মাঠে মাঠে যা-কিছু নিহিত।
>
> এ শ্রমের অন্ত কবে ? সুরু বা কোথায় ? ...'
>
> ('চৈত্রে রচিত কবিতা')

কবি চৈতন্যের সঙ্গে প্রার্থিত শব্দসংঘাতের অতল গহনলোক আবিষ্কারে, তাঁর পরিশ্রমও তাই নিহিতার্থসন্ধানী। শব্দানুষঙ্গের অপেক্ষাকৃত-সুলভ পারম্পর্যগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করা এবং তারপর আবার অবচেতনে পুনঃসংস্থাপনের বিপর্যাস গড়ে তোলা— এই যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, একে কবির আত্ম-অবলুপ্তির অধ্যায় বলেই জানব। কিন্তু সে-'অজ্ঞান-তিমিরতলে' প্রচ্ছন্নকে তিনি দিতে পারেন নিটোল প্রতিমার গড়ন, প্রতীকের ব্যাপ্তি, এমনকি তা দিয়ে তিনি মূর্ত-কেও বিমূর্তেরই অন্তরে প্রোথিত করেন। তিনি তাঁর অন্বিষ্ট চিত্রকল্পের মধ্যে magical power-কেও স্বীকার করেন।

তখন জীবনভঙ্গি ও তদনুযায়ী ভাষাভঙ্গির জোরে শব্দ তার নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণে তৎপর হতে থাকে। বোদলেয়ার এইভাবে ফরাসি সিম্বলিস্ট্‌দের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর বহুখ্যাত correspondance-এর তত্ত্ব। উৎপলের 'দুঃসময়' কবিতায় বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব-সন্ধান, প্রতীকবাদের সেই আদি প্রেরণা থেকেই যে অগ্রসর হয়েছে— তা বলতে পারি। হয়তো এইজন্যই শব্দভুবনের চেনা অর্থ ছাপিয়ে আঁতকায় হয়ে ওঠে এক অপার রহস্যময় ভুবন, যাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বা ইন্দ্রিয়ান্তরসিদ্ধ রূপান্তরে গ্রাহ্য বলে মনে হলেও যার অনেকটাই ইন্দ্রিয়াতীতও বটে। তাই উৎপল ঐ 'দুঃসময়' কবিতায় বলেন :

'... বীজের আঁধারে
ঢেকে রাখি শ্বেত রৌদ্রে আমরণ অন্তঃসার
—আমার চেতনা...'

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

প্রতীকের এহেন অতীন্দ্রিয় চিত্রকল্প উপস্থাপনাই অবশ্য তাঁর একমাত্র বিশেষত্ব নয়, তা এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেও উৎপল প্রমাণ করেন নানা ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুষঙ্গসমূহে। কিন্তু প্রেম ও অপ্রেমের যে বিধুর দ্বন্দ্ব এ-গ্রন্থে উত্থাপিত, তারই উপলক্ষে— কবি কী ভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়জ দৃশ্যজাত উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়াকেও একপ্রকার বিমূর্ত রূপান্তরের বিষয়ীভূত করেন— তার একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ আমি এ বইয়ের প্রথম পাতা খুলেই নাম-কবিতার আদি পঙক্তিতে লক্ষ করতে পারি :

'নিঃসঙ্গ দাঁড়ের শব্দে চলে যায় তিনটি তরণী।...'

('চৈত্রে রচিত কবিতা')

এলিয়ট-বর্ণিত 'auditory imagination'-এর ছায়াপাত ঘটেছে এই চিত্রকল্পটিতে। যখন পড়ছি এই লাইন, তখন সংবেদনশীল শ্রোতার কাছে 'তিনটি তরণী' আমাদের 'শিরিষের রাজ্যকে চঞ্চল করে' যেন 'তিনটি তরুণীরই মতো লীলাভরে' চলে যায়। ছিপ নৌকোর চলনের সঙ্গেই তাদের এত মিল যে এখানে দৃশ্যগ্রাহ্য তিনটি তরণীকে তন্বী তিন নারীর দৃশ্য ও শ্রুতিকল্প অনুষঙ্গের অনায়াস মিশ্রণেই আমরা যথারীতি দেখতে ও শুনতে পাই। উৎপলের রোমান্টিক কবিধর্ম এবং তখনো পর্যন্ত অবিরল লিরিকপ্রবণতায় গুণেই তা সম্ভব হয়েছে। এলিয়ট, বোদলেয়ারের ভাষাশিল্পের সপ্রশংস উল্লেখে, যেমন তার সেকেন্ডহ্যান্ড ইমেজারি প্রয়োগের কথাও বলেন, অনুরূপ তাৎপর্যে, আমরাও উৎপলের পৌনঃপুনিকরূপে ব্যবহৃত 'জাহাজ', 'সমুদ্র', 'রাজহংস,' 'কান্তার', 'পাহাড়', 'ঝর্ণা', 'উটের ঘণ্টার শব্দ', 'গীর্জার সারি', 'পাতালতিমির', 'কার্নিভাল', 'অগ্ন্যানবিধুর রোল' এবং ফের সমুদ্রের 'সোনালি বালির তলে রক্ত নারিকেল' ইত্যাকার চিত্রকল্প বা প্রতীক বা শুধুই অনুষঙ্গময় উল্লেখের প্রাচুর্যকেও অনেকটাই যে তাঁর তখনকার 'reading source' থেকে প্রাপ্ত বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এই বিশেষ প্রবণতাটি পাঁচের দশকের প্রধান কবিদের মধ্যে তখন অন্য

আর একটি কারণেও বলবৎ হয়েছিল। তিরিশের দশকের প্রধান কবিদের পঠনপাঠন ও অনুবাদকর্মের ভিতর দিয়েই পাঁচের দশকের কবিরা পেয়েছিলেন ফরাসি, জর্মন ও অন্যান্য সিম্বলিস্ট্ এবং ইঙ্গ-মার্কিনী ইমেজিস্ট্ কবিকুলের সংসর্গ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ছাড়া, তখন একা বুদ্ধদেব বসুই বোদলেয়ার, হোল্ডারলিন, রিলকে-র নিয়মিত অনুবাদ পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪-৫৮-এর ভিতর বুদ্ধদেবের 'যে আঁধার আলোর অধিক'— নামক কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও রচিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাংলা অনুবাদে বোদলেয়ারের 'ক্লেদজ কুসুম' ও 'রিলকে-র কবিতা'— প্রধানত এ-দুটি বই, তখনকার তরুণতর কবিদের হাতে হাতে ফিরত। অতএব, এ কথা মানতে হবে, প্রাথমিক স্তরে পাঁচের দশকের বাংলা কবিতার ডিকশান ও প্রতিমা-প্রতীকের জন্য এই ব্যাপক reading source-ই— কোনো-না-কোনো ভাবে কার্যকরী হয়েছে। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থটির দ্বারা এঁদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

□ ৫ □

অবশ্য এরূপ প্রভাবের পরোক্ষতা সত্ত্বেও, উৎপলকুমার বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়— গোড়া থেকেই তাঁদের রচনায় চিত্রকল্প ও প্রতীক-নির্মাণে নিশ্চিত সেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের পরিচয় দেন, যা নিছক reading source ছাড়াও প্রত্যক্ষ সংবেদনলব্ধ, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতারই বিষয়। এই দ্বিতীয়োক্ত উৎসসূত্রেই, উৎপলেরও 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র আবহ, অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে তাঁর 'পুরী সিরিজ'-এর স্বেচ্ছা-নির্বাসন, বন্দীত্ব ও স্বাধীনতাকামীর উদাসীন হৃদয়বত্তায় দ্রুত অনুপ্রবিষ্ট হয়। হয় এ-যুগের কবিতার যা শ্রেষ্ঠ মূলধন সেই তীব্র শ্লেষনির্ভরতায়। এই পর্বে, তাঁর কবিতা আরো চিত্রকল্পময়, আরো প্রতীকী। এক সমুদ্রেরই কাছ থেকে তার শুরু। আর আসমুদ্র আকাশ ও দিকদিগন্তব্যাপী তার উৎক্ষিপ্ত বিস্তার। 'ও শ্বেত বৈধব্য, পাখি, তুমি কারাগার রৌদ্র থেকে ফেলে দাও গরাদের ক্রমপরম্পরা ('পুরী সিরিজ')— বলে, তিনি তাঁর সেই বন্দীত্ব ও স্বাধীনতার দ্বান্দ্বিক এসথেটিকস্ রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতিকথনের ঝোঁকও তাঁর এই সময়েরই একটি বিশেষ প্রবণতা। ফলে, কখনো এমন মনে হতে পারে, কবি তাঁর ইমেজিস্ট্ সত্তাকে লঙ্ঘন করছেন এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে automatic wriitng থিয়োরির শরণাপন্ন হচ্ছেন। অপর এক যুদ্ধের কথা তাই মনে আসে তাঁর। কোনো 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র 'অনুপম উড়ন্ত মেঘের পালিতা পাখির মতো' এক মুক্ত ও স্বাধীন কলকাতার কল্পনা ছেড়ে তাঁকে এই 'সামুদ্রিক মফস্বলে' প্রকৃতই ঘোড়সওয়ার হয়ে ওঠার 'অখিল শুশ্রূষা' প্রার্থনা করতে হয়। 'এত বড়ো বেসরকারী আতুরালয়ের নীল ভানুসিন্ধুজলে' লুকোচুরি-খেলার নিমন্ত্রণে, তিনি তখন স্বেচ্ছায় যোগ দেন।

□ ৬ □

আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ছয়ের দশকের শুরুতেই, একদা কলকাতার কোনো কলেজের এক ভূবিদ্যা-র অধ্যাপক, তথাকথিত তাঁর অশ্লীল কবিতারচনার দায়ে এবং হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগানোর অভিযোগে— কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত হন। সেই অধ্যাপক— উৎপলকুমার বসু। জীবনানন্দের পর আরো একবার— উৎপলের প্রতি এই সামাজিক আক্রমণ যথার্থ বামনোচিত। তাই সংগত প্রতিক্রিয়াতে উৎপল তাঁর তাবৎ রণরঙ্গকৌশলের বিপরীতে এক বিসম্বাদী বামনের প্রতীক প্রায় নিয়মিত খাড়া করে তোলেন। আর এইভাবে, তাঁর কবিতার অন্তর্গত শ্লেষ 'কাপাসিবাগানে ঈশ্বরপ্রদত্ত গান্ধা'-র বিচরণশীল রূপান্তরে, স্বভাবতই আবিষ্কার করে এক 'ব্যক্তিগত প্রেত'। এরই পুনর্নির্খন, 'সার্বভৌম বেশ্যাদের প্রকৃতির জীবজগতের আর দারুপুতুলের ছবিগুলি' যে-অঙ্ককে শাণিত করে তোলে সেই অঙ্কের ব্যবহারও তাই অটোমেটিক। সুতরাং কবির এসথেটিকস্-ও বদলে যেতে থাকে দ্রুত, এবং কবিতার ভাষায়, চিত্রকল্পে, প্রতীকে তার প্রতিফলনেরও মাত্রান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে :

> '— আমার সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়শাসন— ভুল বিদ্যাশেখা— ভুল আবিষ্কার— ভুল প্রজনন— ভুল গরিমা ও ভুল তুলাদণ্ড— ভুল ধূপাধার — ভুল পুষ্করিণী— ভুল দেবদারু— ততোধিক ভুল স্মৃতি, মিথ্যাবাদ, খেলাধুলো, বলের লাফানো আর মেঘের ভিতর থেকে আবির্ভূত জীবনের প্রথম এয়ারোপ্লেন— তাও সত্য নয়!'
>
> ('স্মৃতি-২')

তবে এই সেই উৎপল-বিবৃত 'মাতৃজঠর'— যা থেকে বেরিয়েই কলে-কারখানায় তোতাপড়ানো ভুলের কারিগরি থেকে পরিত্রাণের জন্য ফের সেই মাতৃজঠরমুখী সন্তান 'বিষণ্ণতা', আজ আবার 'নেড়েচেড়ে দেখছে জাতকের রক্তমাখা কাপড়-তুলো-ব্যান্ডেজ, এবং এও সত্য যে, যে-হাসপাতালে সে জন্মেছিল সেখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে মরণোন্মুখ মানুষ হিসেবে, না এটি সত্য নয়, এটি রিয়ালিটি...' (পূর্বোক্ত 'ধূসর আতাগাছ')। কল্পের উৎসমুখ দেখাতে গিয়ে একটি দিকে যেমন এলিয়ট তার উৎপত্তিস্থল হিসেবে ধার্য করেন রচয়িতার পড়াশুনোর অভিজ্ঞতার জগৎ, আর অপর দিকটিতে ধার্য হয় তার আবাল্যের সংবেদনশীল জীবন। উৎপলকুমার বসুর 'স্মৃতি-৩' নামক কবিতাটির পরতে-পরতে সেই স্থিতীয়োন্ত উৎসটিই উৎসারিত এবং উদ্দীপন বিভাবে বা এলিয়টের অবজেকটিভ কোরিলেটিভে সমগ্র কবিতাটির জন্য মাত্র একটিই চিত্রকল্প কেন্দ্রস্থ। উৎপল-এর শেষ তিনটি পঙক্তিতে লিখেছেন :

'...সেদিন ছিলাম
বালো, বিষণ্ণতা, তোমারই সন্তান, তোমাকেই
মাতৃজঠর ব'লে মনে হয়েছিল।'

('স্মৃতি ৩')

এরূপ উক্তি প্রকৃতই একজন ইমেজিস্টের উক্তি বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাল্যকালই সেই মাতৃজঠর, 'বিষণ্ণতা' তারই গর্ভজাত সন্তান। 'শুকনো পাতা ঝ'রে যায় কবে / সুদূর (সুধীরলাল) বাংলায় / বিলেতে অনেক আগে কাতর / সন্তাপময় কবিতায় লেখা হ'ত...' ('স্মৃতি : ৩'), এই যে শুকনো পাতা-ঝরার অনুষঙ্গ, যা রোমান্টিকদের তো বটেই, প্রতীকবাদী বা ইমেজিস্টদেরও কম প্রিয় অনুষঙ্গ নয়। পাঁচের দশকের বাঙালি কবি, রিলকের সেই বিখ্যাত 'Autumn' কবিতায় যখন পড়েছেন : 'Leaves are falling...', তখন, সেই পাতাঝরা বিষাদগীতি অবলম্বনে বাংলার হেমন্তে— হয়তো জীবনানন্দীয় জগতে— পউষের পাতাঝরা পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু উৎপলকুমার বসুর এ-কবিতায় ঠিক তা তো নয়। 'বিলেতে অনেক আগে কাতর / সন্তাপময়...' কবিতার বিপরীতে অতি অবশ্য সে-পাতাঝরার বিষাদ বয়ে আনে সুধীরলালের গান : 'মধুর আমার মায়ের হাসি...'। এ-গান চল্লিশের দশকেই আধুনিক বাংলা গান হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। আমাদের বাল্যস্মৃতির সঙ্গে সেই দূরত্ববিধুর মাধুর্য মিশে গিয়ে কত তুচ্ছ কথা কবিতাটির পঙক্তিতে পঙক্তিতে ঢুকে পড়েছে। আমাদের নস্ট্যালজিয়ার যদি কবিতায় কয়েকটি পঙক্তিনির্ভর শিল্প-বিন্যাস দিতে হয় তবে এই তার উপযুক্ত গঠন। অপ্রস্তুত পাঠক হয়তো উৎপলের 'স্মৃতি : ৩' কবিতাটি ঠিকমতো ছন্দোযতি বুঝে পড়েই উঠতে পারবেন না, এমন এক স্বেচ্ছাকৃত এলোমেলো গড়নের আভাস দিয়েছেন কবি। অনুষঙ্গবিধি ও তদনুযায়ী স্মৃতিগুচ্ছের এরূপ উদ্দীপনশক্তি স্বভাবতই অচ্ছেদ্যভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করতে চায়। আর বর্তমানের অবস্থিতি এবং নিরীহ ঘটনাবলীর মধ্যে কখনো কখনো বহুদূর বিদ্যুৎ-চমক এসে পড়ে। তা এমনভাবে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে নিমেষেই আমরা বর্তমান আর অতীতকে একীকৃত করে তৃতীয় অপর কোনো স্থির কালমাত্রায় প্রবেশ করি। উৎপলের এই বিখ্যাত কবিতাটি থেকে সেইরকমেরই একটি বিদ্যুৎ-প্রহার পাঠকের লভ্য। কিন্তু সেজন্য অপ্রস্তুত পাঠককেও প্রস্তুত হতে হবে। পড়তে হবে পয়ারজাতীয় ছন্দের আধুনিকতম যতিবিচ্ছেদের প্রত্যেকটি গোপন বাঁকে থতমত না হয়ে—'perspective kind of reading habit'-এ। তার মড্যুলেশনের সমস্ত স্বরক্ষেপণ-বৈচিত্র্য যথাযথভাবে মানতে হবে। প্রথম পর্যায়ে উৎপলের কবিতার বিন্যাস অত জটিল হয়ে ওঠেনি কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠবে, এইরকম আভাস এসে গিয়েছিল প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-য়।

একদা তাঁর চৈত্রে রচিত মহিমময়ী মনের ময়ূর থেকে গোপন সমুদ্রবিভব কী দ্রুত ঝরে পড়ে ও পরিবর্তিত হয় ভিক্ষু স্থানান্তরিত বেলায়, 'যখন ওষ্ঠে দুই করতল স্ফীত ক'রে

হাঁক দেয় মুক্তার শিকারী…'। ('প্রকৃতির ছবি') এখানে নেমে, উৎপল লেখেন : 'প্রতি ধর্ম বলে দেয় : আমি চাই অসম্পূর্ণ পাঠ।' ('প্রকৃতির ছবি') ব্যাপারটি তাঁর 'আরো প্রকৃতির ছবি'-তে যেসব দৃশ্যকল্প ও শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের নিরীহ রূপ সৃষ্টি করে, সেখানে, কবির প্রত্যক্ষবেদন (perception) পায় জলের প্লাবনে 'মুক্তা'। আর তারই তরঙ্গাভিঘাতে আরো দূরে 'সমুদ্রকপাটের' এক গোপন 'auditory imagination'-নির্ভর দুই প্রবল হাতে খিল খোলার অসম্পূর্ণ আয়োজন। 'যেখানে জলের রঙ লৌহমরিচার / শিকলের মতো লাল…'। সেইখানে— 'জলের গভীরে রুদ্ধ শৃঙ্খলের ধ্বনি!' ('প্রকৃতির ছবি')।

প্রত্যেকটি বস্তুধর্ম ও তার 'অসম্পূর্ণ পাঠ'-জনিত যে poetic intuition 'মুক্তা'কে 'সমুদ্রকপাট' মুক্ত করার গোপনীয় আততি পর্যন্ত ব্যাপৃত করতে পারে— সেই অশ্রুত ও অদৃশ্যের ভিন্নতর দৃশ্যমহিমা, কবিকে তাঁর অনন্তর নিরীক্ষাশক্তিতে আবিষ্ট করে। তিনি লেখেন :

> '…চূর্ণ সবিতার দিন ক্রমাগত দূরে সরে যায়।
> যেখানে সৈকত তৃণ অর্ধেক আলোকগ্রস্ত অর্ধেক ঢাকা।
> যেখানে রুপোয়-গড়া সুবর্ণের, তরঙ্গের অতীন্দ্রিয় চাকা
>
> আগুন উড়ায় দ্রুত! মৌমাছি কি গতিদিব্যতায়
> আবার বসন্তদিনে খুলে ফ্যালে রান্নার হাঁড়ি
> যখন প্রস্তুত সব, ধোঁয়া ওঠে, ক্ষুধা, কাড়াকাড়ি ?'
>
> ('আরো প্রকৃতির ছবি')

'সবিতা', 'সৈকত তৃণ', 'রুপোয়-গড়া সুবর্ণের, তরঙ্গের অতীন্দ্রিয় চাকা'; আর মৌমাছির 'গতিদিব্যতা' যা বসন্তদিনে খুলে ফ্যালে রান্নার হাঁড়ি— এই প্রস্তুতি, আসলে 'ধোঁয়া', 'ক্ষুধা', 'কাড়াকাড়ি'-র উজ্জীবিতায়— দৃশ্যান্তরে কবির সমুদ্রবিষয়ক তাবৎ পোশাকিয়ানারও অবসান। 'রান্নার হাঁড়ি'-ই সে যাত্রায় আপাতত এক জৈব আশ্রয়। যেখানে, চিত্রকল্পের বিমূর্ত লোকেশান্ এই প্রথম একটা 'লাল টালি'-ছাওয়া 'সাদা বাড়ি'-র দিকে উঠে আসছে দেখি। তাহলে, প্রচলিত এমনকি প্রসিদ্ধিসূচক শব্দেও কিছু যায় আসে না, যদি থাকে তারই মাঝখানে এক উন্মুক্ত 'রান্নার হাঁড়ি'! চিত্রকল্পের অতীন্দ্রিয়তা যে এইভাবেও আদায় করে নেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিপর্যাস, আর তখন ফোড়নেরই ঝাঁঝে 'হ্যাঁচ্চো' ব'লে— এতকালের পরিচিত সংস্থানগুলোকেই যা-হোক বদলে দিতে পারি। শব্দ দিয়ে এমনি অদলবদলের রূপরেখাগুলি— যেমন,

> 'তুমি সম্রাট, প্রভু ও যাতায়াতকারী পথিকের দেবতা
> তুমি এক কাঠা মদ দাও আর আমাদের
> দাইমা-কে ফিরে দাও…'
>
> ('আকাশযান')

এক লোকায়ত উপাখ্যানস্তরে, আমাদের নব্য সমাজৈতিহাসের গড়ন একই সঙ্গে মহাকাব্যের পুরাণ ও ইতিহাস-নির্ভর এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের 'বৃষ ও মানুষ' ঐহিক আমোদের জোগান বজায় রাখে। আর তারই জন্য 'শূল্ক' আদায়ের প্রথানুগত। যদিও সে শূল্ক 'যাতায়াতকারী পথিকের' ঝুড়ি থেকে তুলে নেওয়া 'বজ্রসেগুন পাতা'! অর্থাৎ, যে অক্ষরধৃত পাতা— বজ্র তুল্য সারবান্, তা-ই পথিকের আয়ুধ 'সম্রাট, প্রভু' বা 'দেবতা' যা অজ্ঞাতসারে 'শূল্ক' বলে ছিনিয়ে নেয়। পথিক বলে— 'দেখহ বিচারি'। এই বিচারের ইতিহাসই আধুনিক সমাজৈতিহাস। যা এখনো 'দেবতার' অজ্ঞাত বা অনায়ত্ত বা অনাধীন। 'আকাশযান'-নামক কবিতাটিকে অমূলক 'এক-কাঠা মদ' ও 'দাইমা-কে' ফিরে পাওয়ার স্বাদু, স্তন্যপায়ী প্রাগিতিহাস থেকে আমাদের আধুনিক সোশিয়ো-ইকনমিক তথা পোলিটিকাল হিস্ট্রি পর্যন্ত পথিক সেই 'দেবতার'ই মুখাপেক্ষী। অতএব 'দেখহ বিচারি' এই আর্কেয়িজম সেই ইতিহাসের শ্লেষ ও 'বজ্রসেগুন পাতা'র অনন্ত সম্ভাবনা। এ কবিতার 'কাগজসন্ন্যাসী'-র কাছেও তা-ই রচনাটি ১-২-৩ এই পর্যায়ক্রমে বিবৃত হয়েছে। স্বভাবতই, 'কাগজসন্ন্যাসী' শব্দটির অন্তরে ওতপ্রোত এক অনুষঙ্গ থাকে— ফরাসি সিম্বলিস্ট্ কবিদের শীর্ষস্থানীয় মালার্মের সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত 'নীলিমা'-য় যা উল্লিখিত হয়েছে 'রিক্ত কাগজের শুভ্র স্বগত সংযম' রূপে।

□ ৭ □

উৎপলের কবিতা অবশ্য তাই বলে মালার্মেপন্থী বস্তুজগৎকে শূন্যতায় প্রতিফলনের বিশুদ্ধ ও বিশদ শিল্পকারিগরির প্রশ্রয় নয়। মালার্মের 'Void' উৎপলের হাতে এক অকৃপণ ভাষাশিল্পের কখনো গ্রামীণ লোকায়তিক, কখনো বা নাগরিক-লোকায়াতিকের নিরীক্ষাশক্তি ও বিশ্লেষণের প্রতীকী বিন্যাস। এখানে আমি পরপর দুটো উদাহরণ তুলে ধরছি :

ক. আমরা খরিদ করি তামাক মূলত আমাদিগের পিতা ৺মুরারী সাহা তাং···মৃত ও ঐ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দোকান ও প্রেস বন্ধকী রেখে আমরা সন··· এই দেশে আসি অনুপায় যাঁদনা সরকারী / বেসরকারী খাস-দখলের জন্য উক্ত জমি চাষ ও বীজ বপনের শর্তে জলসেচ পরিকল্পনা তেমন সুষ্ঠু হয় না কারণ ভাগচাষীদের মধ্যে পরস্পর বিবেচনার অভাব আমাদিগের ভাইবোনের ভিতরও তেমন বিচার নাই দ্বিতীয় ভগ্নীপতি কৃপণ ও অসদাচারী

খ. এবং আমাদের এই প্রয়াস গ্রন্থ-রচনার আড়াআড়ি দপ্তরীদের দোকান অধিকাংশ মুসলমান তা হোক পদ্ধতি অনুসারে হয় ইলাহি যেমন দুরভিগ্রহ ও দেহাতী ভূষণ ও ব্রজচামর রক্ত ও তেল কিন্তু বিচার নাই আমরা চাই পরিবার চাই রেশনের বাইরে ঘর পিছু সম্বৎসর চাল ও জ্বালানি ও সরিষা মাথাপিছু দুই কেজি উক্ত

দরখাস্তে আমাদিগের সই ছিল সাতজন অনুপস্থিত অর্থাৎ মৃত বা রুগ্‌ণ আমাদের তিনজনের সই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হোক এই আবেদন

('স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম')

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি যে কবিতার অন্তর্ভুক্ত, তা একটি 'ব্যাপার সম্বন্ধীয়' আবেদনপত্রের আদলে চারটি গদ্য-অনুচ্ছেদে মুদ্রিত। এবং তা এমন এক প্যাটার্নের কাছাকাছি এসেছে— যাকে পূর্বোক্ত গ্রামীণ-লোকায়তিক ও নাগরিক লোকায়তিক Speech-pattern-এরই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কজাত এক প্রতীকী বিন্যাস বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। লোকসাধারণ্যে যে-অভিজ্ঞতা, ভাবভাষা ও প্রকাশশৈলী সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াসসিদ্ধির কারক— তা-ই লোকায়তিক। তাতে গ্রাম ও নগরভেদে লোকসম্প্রদায়ে Speech-pattern-এরও মাত্রান্তর অনিবার্য। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণও যে এই মাত্রান্তরের দ্বন্দ্বকে শিরোধার্য করে— তা বলা বাহুল্য। লক্ষ করতে হবে, আলোচ্য কবিতায় উৎপল উক্ত দ্বন্দ্বের দুটি দিকের জায়গায়— 'শারদ মধুপুরে দেখেছিলাম' বলে অতঃপর একটা তৃতীয়মাত্রারও অবতারণা করেছেন। সেটি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের দিক। 'ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্র'-তে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক রীতির লোকব্যবহার থেকে আরও অন্তরঙ্গ স্তরে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের আরোপ ব্যাপারটি আমাদের বুঝিয়ে দেয় আমরা এই ভাষা-জগতের ধ্বস্ত ও ধারভারহীন কোন্ গাড্ডায় পড়ে গেছি। ললিতলাবণ্য রোমান্টিক ক্লিশে থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই 'যা ব্যাপার সম্বন্ধীয় পত্র ব্যবহার'-এর কম্পোজিশান এবং তাকেই আপাতত একটি প্রতীক হিসেবে তিনি খাড়া করেন। এইভাবে আমাদের গ্রামীণ-লোকায়তিক ও নাগরিক-লোকায়তিক বাক্‌পদ্ধতির স্বন্দ্বময়তার দুটি ভিন্ন-ভিন্ন মুখ, যথাক্রমে উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটিতে ফুটে ওঠে। কিন্তু যা অপরিস্ফুট থাকে, তা হল তাঁর কবিব্যক্তিত্ব উন্মোচন দিয়ে তিনি যে-তৃতীয়মাত্রায় কেন্দ্রস্থ হতে চান। তা-হয়তো তখনো সেই পদ্ধতিগত দ্বন্দ্বের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে না। পারে না, কারণ স্বপ্নদৃষ্ট ফ্র্যাগমেন্টেশন এখানে শুধুই অনুষঙ্গমাত্র, তখনো ইমেজ হিসেবে প্রতিফলনের অপেক্ষায়। তাঁর এই প্রয়াসের আরো অভিনবত্ব ও সফলতার পরিচয় পেতে হলে আমাদেরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হয় কবির পরবর্তী কাব্যপুস্তিকা 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) ও 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন' (১৯৮৬) পর্যন্ত।

□ ৮ □

তবু এরই আগে, 'আবার পুরী সিরিজ'-এ উৎপলকুমার বসুর কবিতার অন্যান্য বিভবগুলিও তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসেরই যে অন্তর্গত থাকে, তার একটু পরিচয় নেব। পূর্ণ তালিকা আপাতত নিষ্প্রয়োজন। তবে কয়েকটি উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ জরুরি :

১. 'সাদা ঘোড়া, তোমার কেশরে আমি হাত দিয়ে আজ
বুঝেছি কেমন শ্বেত কবুতর, স্বাস্থ্য, দুধ, সূর্যের পাহারা...'

('সাদা ঘোড়া')

২. 'কুয়াশায় রাজহংসের ফৌজ দৌড়ে চলে যায়। ...'

('ফেরীঘাট')

৩. 'বনের ভিতর আজ সকালের উদ্দেশ্যবিহীন দমকল একা একা ঘুরছে আমাকে টেনে নিয়ে চলো ঐ অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা আমারও আছে স্ত্রী আছেন পুরুষের আয়ত্তে যেমন ফুল আছে দানবীর আয়ত্তে যেমন আমার কয়েকদিন ব্যথা হ'ল বাঁ চোখে এবং আতঙ্ক হ'ল অন্ধতা আমার বেশিদূরে যাবে কি যৌবনে— নাহয় গাড়ির টায়ারচিহ্ন ধ'রে চলেছি এবার গভীর বনের দিকে দমকল কিছু আগে গেলে'...

('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি')

৪. 'কিছু কিছু ঘোড়া আজ নেই
এবং সাহিস একা প্রাসঙ্গিক নয়
এজন্যই ফিরে আসে ঘাস আর ঘাসের জন্ম হয়
শরতকালীন
আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তিবোধ হতে থাকে।'

('নীলকুঠি')

৫. 'দূরত্বই বোধ, বুদ্ধি। অপ্রাপণীয়ের
বিস্ময়, মমত্ব, ক্ষোভ। মানুষের যা-কিছু সম্বল।
ফুল তাই গন্ধে আজ আমাদের সতর্ক করেছে।...'

('উনিশশো বাষট্টি শেষ হ'ল')

৬. 'হেমন্তকালীন সাদা খড়ি দিয়ে আঁকা হয় সৌন্দর্য বোশ্বেটে।
অমন সৌন্দর্য আমি হাতে পেলে চলে যাই নবদ্বীপ
আবিষ্কার-করা আর আবিষ্কৃত হওয়া থেকে উল্লাসের চোটে
পরস্পর চিঠি লেখালেখি অব্দি থেমে যাক। ট্রাক্টর, জীপ
পরিকল্পনার মতো কবিতার কালো ক্ষেত চষে খায়। ছিঁড়ে যায়
আধোঘুমে মশারির পায়ের দিকের পাড়। ভালো নাগরিক
হতে চাই। নবদ্বীপে, ফরাসী শেখার ক্লাসে, বকুলবাগান থেকে চৌরঙ্গী পাড়ায়
হেমন্তের কোণা ধ'রে শুয়ে আছি এবারের সৌন্দর্য ও মশার জ্বালায়।'

('তেরজা রীমা')

৭. ...'সোনার নৌকা, তুমি নিয়ে যাও যা-কিছু সম্ভব
সোনার বিড়ালী, তুমি নিয়ে যাও মেয়েদের,
শিশুদের নিয়ে যাও,

খুন করো, খোজা করো, মুছে ফ্যালো উল্কির লিখা
ফেলে দাও ধানখেতে, নদীজলে ব্যবহৃত শব।...'

('যুদ্ধের ডাক এসেছে')

৮. 'তোমাদের বিচালিগাদায় আমাকে দিয়েছে ঘর—
গ্রীষ্মে এতে আগুন লাগাব'

('আগুন আগুন')

৯. 'খড়া, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে'

('ভোর থেকে দেখছি আগুন')

১০. '—আমাদের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতিষ্মান জড়
দেবতার থালা দেখা দিতে পারে—বুদ্ধদেব বসু যদি আমেরিকা থেকে ফিরে না
আসেন তবে এই কথা তাঁকে আর চট ক'রে জানানো যাবে না— আমি তো
মুর্শিদাবাদ চলে যাব এই আশ্চর্য জিনিস দেখাতে— কবে ফিরব ঠিক নেই—'

('এ সপ্তাহটা কেমন যাবে')

১১. '...জানোয়ার
যে-ভাবে ভয়ে ঘুরে দ্যাখে চারদিক তেমনই চিরস্থায়ী
বিদ্যুৎ-চমক চার পাঁচ মিনিট আলো ক'রে রাখে
ফুলের টব, কাপড়-শুকানোর তার—'

('চিঠিপত্র : ৭')

১২. 'দিতি-অদিতির কোলে মাথা ডুবে যায় শেষ-রজনীর চাঁদ।
আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা দেখা দিক।
ডাকো। যারা কবিতার বিরুদ্ধতা করে
আজ ঈগলের, পাখিদের রাজা স্বচক্ষে দেখুক।'

('চিঠিপত্র : ৮')

১৩. '...সাদা বরফের ধার দিয়ে সেলায়ের ছাপের মতন
প'ড়ে থাকে পদচিহ্ন তোমাদের।...'

('ভ্রমণকাহিনী')

১৪. 'যা নয় তোমার বাহু তা-ই কালো তা-ই অন্ধকার :
উচ্চকিত তান ধরে গাছে গাছে নপুংসকদল...'

('রাত্রির বাতাস')

১৫. 'আছে ভয়
মেঘের সারল্য আর বালুচর যেভাবে খেলছে'

('ট্রেনে লেখা কবিতা')

১৬. 'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চিঠি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট-পাজামার মতো বাস্তবিক।

একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হতে চলে গেছে।'
('এই সংগ্রহের শেষ কবিতা')

□ ৯ □

উৎপলকুমার বসুর প্রধান কাব্যগ্রন্থ এই 'আবার পুরীসিরিজ' (১৯৭৮)। যার ভিতর গত ষাট-সত্তর দশকে লেখা তাঁর প্রধান কবিতাগুলিই চোদ্দ বছর আগের পূর্বপ্রকাশিত 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪)-এর 'পরিমার্জিত চতুর্গুণ বিস্তার' লাভ করেছে। গ্রন্থটির পিছন মলাটে যেমন ঘোষিত থাকে : **'এতে সমুদ্র, বামন, তাঁতকল, শিকারী, সতী, নপুংসক, মিসিবাবা, এয়ারোপ্লেন, সূচ ও আত্মা, রণরক্ত ও সন্ধ্যাবাতাস, কৈবল্য ও ঈশ্বরোপাসনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এক নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লী খুলে দেখানো হ'ল এই গ্রন্থে।** যখন বর্তমান আলোচনার জন্য আমি উদ্ধৃতিগুলি সংগ্রহ করছিলাম, তখনো চতুর্থ মলাটের এই ঘোষণাটি আমার চোখে পড়েনি। এখন, অক্ষম আলোচকের হতাশার মুহূর্তে, যখন বইটি উল্টে রাখছি, দেখি কবিকৃত এই ব্লার্ব। কেউ যদি এখন জিজ্ঞেস করেন, বইটি কী-বিষয়ে লেখা হয়েছে, তবে তার সদুত্তর নিশ্চয়ই এই কবির নিজের ঘোষণা, যার আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু মজা এই, আমার উদ্ধৃতিগুলি ও তার আগেই কবিতা ধরে ধরে যেটুকু আলোচনা করেছি, তা এই বলছে : ঐসব বিষয় বা প্রসঙ্গগুলিই এ-গ্রন্থের প্রামাণ্য লক্ষণীয় বিষয় নয়। যদি তা হত, তাহলে— তা-ই হত এ-বইয়ের পক্ষে এক বিচিত্রতর ফ্যান্টাসি। এবং উৎপলের সাম্প্রতিক শিল্পতত্ত্ব ভাবনা-অনুযায়ী, আমরাও এই প্রশ্ন করি : 'যদি তা না হ'ত', তখন স্বয়ং কবিই হয়তো বলবেন : 'তাহলে ওগুলো হ'ত রিয়ালিটি'। কবিতার ইমেজ সৃষ্টির প্রয়োজনে ইমাজিনেশনের তুলনায় ফ্যান্টাসি হয়তো কিছুটা নিচুস্তরের জিনিস। আর তা-ই যদি হয়, তবু, ইমেজিস্ট্রা নিশ্চয় ভোলেন না যে, এই ফ্যান্টাসিই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণের, তথা বাস্তবতার সমগ্রতা অনুধাবনে, অনুষঙ্গসহ খণ্ডীকরণেরই শক্তি। সার্ত্র যাকে বলেছেন— 'the power of making all parts into a whole'। প্রচলিত অভিজ্ঞতার গল্পকথা বা তার ভগ্নাংশ থেকেও কাব্য কল্পনার সূত্রপাত হয় প্রত্যক্ষত কবিরই সৃজনকৌশলে। তখন কবির স্মৃতির বিষয় ও তার নান্দনিক মূল্যবোধ ক্রমশ এমন একটা আকারপ্রকারহীন অবস্থায় এসে পড়ে যে তার বিমূর্ততা পাঠকের অসহনীয় হলেও তা-থেকে আবছা কোনো অনুস্মৃতি যা-হোক জেগে ওঠে। কল্পনা ও কল্পবস্তুর মধ্যস্থতা-সূত্র সেক্ষেত্রে অপরিহার্য। হয়তো দার্শনিক বিচারে, মনোবিজ্ঞানী বলছেন, (অধ্যাপক এস. আলেকজান্ডার) এই মধ্যস্থতার জন্য কবির অন্তর্দৃষ্টি (introspection) জরুরি। জরুরি, যেহেতু তা যথার্থই বস্তুমুখী হয়ে মনঃপ্রকৃতির বিশাল ভাবাজগতে প্রবেশাধিকার পায়। অন্তর্দৃষ্টি (introspection) ও অনুষঙ্গবিধিই (laws of association) তা পাইয়ে দেয়। সাধারণত কোনো সজীব

অভিজ্ঞতা, আমাদের কাব্য অভিজ্ঞতার সচেতনতায় রূপান্তরিত হওয়ার আগেই, তার অন্তর্বর্তী যোগসূত্র স্বরূপ এক প্রগাঢ় চিহ্নময় রূপ লাভ করে। এমনকি বিচিত্র শব্দানুশাসিত 'human perspective' মধ্যস্থতার তাৎপর্যেই যে তার বস্তুসঞ্জাত ক্রিয়া ও সংবেদন জাগাতে সক্ষম— তা বলাই বাহুল্য। নড বোদ্‌কীন আমাদের কাব্য-অভিজ্ঞতার আদি রূপকল্প বিচারে তাই ফ্যান্টাসির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন :

'It is in the process of fantasy that the contemplated characters of things are broken from their historical setting and made availlable to express the needs and impulses of mind.'

(Archetypal Patterns in Poetry)

আধুনিক স্বপ্নতত্ত্বকে সাক্ষী মেনে, তিনি বলেন, ঘুমন্ত মনে যে বিভ্রান্তিকর চিত্রকল্পগুলির জন্ম, তারা মনে আমাদেরই আবেগদীপ্ত পারস্পরিক ক্রিয়া বলবৎ রাখে। যদিও সুপ্ত মন আনুষ্ঠানিকরূপেই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাহীন। আবার, বিনিদ্র অবস্থার ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসিগুলি, বা মিথ ও উপকথা তাদের emotional pattern অনুযায়ী স্বপ্নেরই মতো চমৎকার ও অদ্ভুত। আবার সেই স্বপ্নবৎ চিত্রকল্পগুলিও একটা যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিফলনই পায় যখন তা শব্দে সমর্পিত হয়। এইভাবেই আমরা অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ রূপান্তরগুলির একটা তুলনামূলক বিরোধিতা বা বৈসাদৃশ্যেও এসে পড়ি। সুতরাং, চিত্রকল্পের আপাত-অসংলগ্নতা কোনো কবির ব্যক্তিগত প্রহেলিকা-সৃষ্টি নয়, বরং বোদকীনের মতো আমরাও হয়তো এই ভাবব :

'When a great poet uses the stories that have taken shape in the fantasy of the community, it is not his individual sensibility alone that he objectifies. Responding with unusual sensitiveness to the words and images which already express the emotional experience of the community, the poet arranges these so as to utilize to the full their evocative power. Thus he attains for himself vision and possession of the experience engendered between his own soul and the life around him, and communicates that experience, at once individual and collective, to others, so far as they can respond adequately to the words and images he uses.'

(Archetypal Patterns in poetry)

বড় কবির 'tragic poetry' জাতীয় মহৎ শিল্পকর্ম সম্পর্কে যা সত্য, ঠিক সেই সূত্রগুলিই আমাদের কালের খণ্ড কবিতার বিচারে ততটাই প্রাসঙ্গিক কিনা— সে তর্ক থাকছেই। তবু ভাবতে দোষ কী— মহাজনপন্থার কোনো-কোনো দিকে আমাদের আধুনিকতা, নিশ্চয় তার সুদূর বা অনতিদূর আত্মীয়সম্বন্ধে কিছু একটা

দিশা পেতেই পারে। এই শতাব্দীর তিনের দশকেই তো ক্যারোলিন স্পার্জন তাঁর *Shakespeare's Imagery* গ্রন্থে প্রধানত ইন্দ্রিয়ানুগত ও ইন্দ্রিয়াতীত চিত্রকল্পের প্রকৃতি নির্ণয় করেছিলেন। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রভাবাধীন বস্তুজগতের দৃশ্য-শ্রুতি-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ-সম্পর্কীয় কাব্য-অভিজ্ঞতা কতদিকে বিস্তীর্ণ হয়েছে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অপরাপর মাধ্যমগুলির তুলনায় এক দর্শনেন্দ্রিয়ই তার আধিপত্যে এ-যাবৎ যতটা প্রাধান্য বজায় রেখেছে, তাতে স্পার্জনের এমন উক্তি সর্বৈব সত্য। তিনি বলেন :

'....it is indeed the gateway by which so large a portion of life reaches the poet, and the registration, description and interpretation of things seen depend so completely on faculties of mind and imagination— that to deal with this sense at all adequately almost amounts to the same thing as to deal with the man as a whole and his work in its entirety.'

(*Shakespeare's Imagery*)

এই দৃক্‌শক্তি কবিমন ও কল্পনারই এক বিশেষ শক্তি, যা আপাত অর্থে, কোথাও ফ্যান্টাসির বহিরাবরণ লাভ করেও আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে রিয়ালিটির মাত্রিক সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম।

ধরা যাক 'সমুদ্র' নামক একটি বিষয়ানুষঙ্গ, যে-বিষয়ে বাংলা কবিতায় মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপলকুমার বসু পর্যন্ত প্রায় সকলেই তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের-নিজের মতো করে চিত্রকল্পের দিকে গিয়েছেন। একই দেখার বিষয় কত ভাবে ও রূপে অদলবদল হয়ে গেছে। যেমন, উৎপলের 'ময়ূরে কবিতাটি স্মরণ করলে, গোড়া থেকেই তা যেন বিষয়ান্তরিত হয়ে ও রূপান্তরিত এক প্রতীকী চিত্রকল্পের বিন্যাস লাভ করে।

বস্তুত তিনি তাঁর প্রভূত দৃশ্যকল্প ইমেজগুলির ভিতর অনেক সময়ই ফ্যান্টাসি ও রিয়ালিটির আপাতদূরত্বকে প্রতীকের মতো ব্যবহার করেন। কবিতায় শ্লেষ নির্মাণের সহায়ক হয়ে ওঠে এই তথাকথিত দূরত্বের সম্বন্ধ। বলেন :

'...দূরত্বই বোধ, বুদ্ধি। অপ্রাপণীয়ের
বিস্ময়, মমত্ব, ক্ষোভ। মানুষের যা-কিছু সম্বল।'...

('উনিশশো বাষট্টি শেষ হল')

তার মানে শিল্পেরই শর্ত পূরণ। কবির দৃক্‌ভঙ্গিমায় ইনটেলেক্ট ও ইমোশানের মিশ্র প্রক্রিয়া কখনো একীকৃতরূপে, কখনো বা আলাদা-আলাদা খণ্ডীকরণের তীব্র প্রতিফলন

হয়ে, স্পর্শ করে কোনো সম্ভাব্য কম্পোজিশনেরই সমগ্রতাকে, তার অ-লৌকিককে। এই তাৎপর্যে, তার 'সাদা ঘোড়ার কেশর' স্পর্শমাত্রেই পেয়ে যায় যেন এক প্রতীকী দৃশ্যাবকাশ, অর্থাৎ বস্তুজগতেরই একটা visual ও conceptual space-এর এক-একটি টুকরো। আর এইসব টুকরো জুড়েই তাঁকে গড়ে নিতে হয় তাঁর সমগ্রতার নির্মাণ। কী ভাবে— তা বলছি। আমরা 'সাদা ঘোড়া' কবিতাটির পূর্ণ রূপ দেখি :

সাদা ঘোড়া

সাদা ঘোড়া, তোমার কেশরে আমি হাত দিয়ে আজ
বুঝেছি কেমন শ্বেত কবুতর, স্বাস্থ্য, দুধ, সূর্যের পাহারা,
বুঝি নি গোপন পথে কিভাবে বা চলে যায় ছিন্নবাহু তারা
অজস্র পণ্য নিয়ে— বালি ভেঙে, ক্রমাগত সূর্যহীনতায়

পশ্চিমে, ঢালুর দিকে। পিতৃহীন রণক্লান্ত মহাদেশ জানে
প্রবল হাতুড়ি গড়ে ধর্ম শুধু। পড়ে গেছে সাড়া।
অদ্ভুত বাতাস— তাকি দোলা দেয় খেজুর-মর্মরে ?

নীল তাঁবু স্ফীতমান, হায় ক্রেতা, হায় রে মার্জার
মৃত ঘোড়াদের অন্ন ফুলে ওঠে ক্ষুধার্তের হাতে।

কবি যখন 'সাদা ঘোড়া' বলে শুরু করেন, তখন 'সাদা' শব্দটির ওপরেই এমন এক জোর আছে মনে করি যে তার ইনটুইটিভ্ ভাষাপ্রকৃতি রঙের সমস্তপ্রকার কম্বিনেশন সত্ত্বেও— এক 'nothingness'-এর প্রতীক। 'বুঝেছি' এবং 'বুঝিনি'— উক্ত কবিতাটির পরস্পরবিরুদ্ধ এই দুটি প্রস্তাব— একদিকে ঘোড়ার কেশরের স্পর্শসহ ইন্দ্রিয়ময়তায় আমাদের প্রেমপ্রীতির গার্হস্থ্যাশ্রম-সূচক 'শ্বেত কবুতর'-এর কমনীয়তা জাগায়, 'স্বাস্থ্য' ও 'দুধ'-এর অনুষঙ্গে আনে স্পর্ধিত যৌবন ও তার আস্বাদ্যমানতা, আর এইসব সফলতার জন্যই উল্লিখিত 'সূর্যের পাহারা' থেকে এসেছে দিনগুলির সতর্ক প্রহরার অর্থবোধকতাও। অন্যদিকে, সেই অন্তর্থকই 'ছিন্নবাহু'। ঘোড়া-কে যখন ঐ 'ছিন্নবাহু' শব্দটির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা যায়, তখন স্বভাতবই 'রণক্লান্ত' ঘোড়সওয়ারদের পতন ও প্রত্যাবর্তনের মুখে— কোনো ডানাকাটা পক্ষীরাজের মিথ, তথা ফ্যান্টাসির প্রশ্রয়ও হয়তো অসম্ভব নয়। যেহেতু 'সূর্যের পাহারা'— 'ক্রমাগত সূর্যহীনতায়/পশ্চিমে, ঢালুর দিকে' আপাতত এক ট্রাজিক পরাভবে পরিসমাপ্ত। আমাদের প্রত্যক্ষ অর্থবাচক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া ও 'পণ্য' কিনে আনা ইত্যাদি আর্কিটাইপাল অনুষঙ্গের অসদ্ভাব নেই সত্য, কিন্তু পরিণামে— 'পিতৃহীন রণক্লান্ত মহাদেশ'— ও ততোধিক সত্য যেখানে 'প্রবল হাতুড়ি গড়ে ধর্ম শুধু'। 'হাতুড়ি' শব্দটি নিশ্চয় এক্ষেত্রে তার মর্মাঘাত মাত্র। সেই 'মহাদেশ' বা দৃশ্যমান মহাকাশটি যেন

এক 'স্ফীতমান নীল তাঁবু', যদিও ব্যর্থ 'ক্রেতার' জীবনে তার টাট্টু ঘোড়াটি আজ বুঝি 'মার্জার'-এ পরিণত। অতএব, 'সাদা ঘোড়া'-র শেষ পঙক্তিটি এই : 'মৃত ঘোড়াদের অন্ত্র ফুলে ওঠে ক্ষুধার্তের হাতে।' কবিতায় প্রকাশ্য বোঝাপড়া এবং অপ্রকট না বোঝার 'গোপন পথ'— এই দুই তরফা প্রতিবেদনের উপর— কীভাবে এক দীপ্ত মধ্যাহ্নের খরসূর্য ঢলে পড়ছে ও শূন্যগর্ভ সূর্যহীনতায় তমিস্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে— সেই nothingness-এর প্রতীকী-চিত্রকল্পটিই এই রচনার প্রধান বিষয়। এবং ঘোড়া নামক বিষয়ানুষঙ্গ থেকে যা ক্রমেই একটি বিষয়হীনতার পর্যবসান লাভ করেছে। যদি বলি, শব্দকে এমন চূড়ান্তভাবে নিঃস্বভাবীকৃত করার মালার্মেপন্থী 'গোপন পথে'— উৎপলকুমার বসুর পদক্ষেপ আকস্মিক, তবেই বোঝা যাবে, এ পথের বিপরীতে তাঁর অধিষ্ঠান 'ঘোড়া', 'সাহস' ইত্যাদির প্রসঙ্গান্তরে 'ঘাস' ও 'ঘাসের জন্ম'কেই 'শরৎকালীন আবহাওয়ায় আমাদের ক্লান্তিবোধ' বলছে কেন। (দ্র. পূ., ৪) শূন্য আকাশ নয়, মালার্মেপন্থী 'নীলিমা'ই কি পূর্বোক্ত 'নীল তাঁবু' ছেড়ে উৎপলের স্বকীয় 'নীলকুঠি'-তে এসে পড়েন? একই বইয়ের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্যবধানে— 'সাদা ঘোড়া' ও 'নীলকুঠি'-র মতো কবিতায় তাঁর বস্তুনিরীক্ষার পরস্পরবিরুদ্ধ প্রকৃতিতে যথাক্রমে negation এবং affirmation-এর দুটি দিকই যেন লক্ষণীয় হয়েছে। প্রথমোক্ত নীলিমামণ্ডলে, তিনি শূন্যেই প্রতীকী, অতএব সাংগীতিক। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তা-ই অবয়বপ্রধান, ঈষৎ ন্যারেটিভ ও অবশ্যই চিত্রকল্পময়। উৎপলের পুরী সিরিজ-এর প্রতিমা-প্রতীকে এই দুটি প্রবণতাই সমান গুরুত্বে স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে করি।

খুব ভালো হত, আমাদের উত্থাপিত উদ্ধৃতিগুলির সমূহ-বিশ্লেষণ। কিন্তু স্থান-কাল-পরিসর বিবেচনা করেই আপাতত তা থেকে বিরত থাকছি। বিরত থাকছি কিন্তু রণে ভঙ্গ দিচ্ছি না। বরং বলছি আবার, ঐসব উদ্ধৃতির স্মরণীয়তা আপনাদেরও নিজের নিজের বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে উঠলে, তবেই বাংলা কবিতায় অধুনা উৎপলজাতীয় বিতর্কেরও প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে।

□ ১০ □

তাঁর 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) ও 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' (১৯৮৬) নামক অপেক্ষাকৃত দুটি ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকায়, উৎপলকুমার বসু আরো গ্রাহ্য ও গভীর হয়ে উঠলেন কি, বিশেষত, আমাদের অনর্থক হাসাহাসির মুহূর্তে। অথচ তিনি নিজে যখন হাসছেন— ঈষৎ বাঁকা ধরনে, তখনি 'বিজলীবালা' শব্দটিরও রমণীয় শ্লেষ পাঠকের অপটু হিন্দুস্থানী উচ্চারণে— যথেষ্ট ছুঁচোলো মনে হয়। মনে হয়, 'বিজলীবালা'র গোঁফ থাকাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, কোনো 'সার্কাস তাঁবুর পথে যেতে যেতে/কতখানি মুক্তি চাই' ভাবলেও তো একরকমের জীবনদর্শন হয়? উত্তরে, মুচকি হাসি ও স্টেটমেন্ট্— 'দুহাত চার হাত'। অর্থাৎ, 'ভিখারির সহচর পারিয়া কুকুর ঠিক যতখানি মুক্তি পায়'! তাহলে, অনেক মুক্তি। আর সেই মুক্তির সমাজ ইতিহাসও ভাবুকদের চুপ-করে থাকার

'আরেক ভাষায়' অলিখিত হয়ে গেছে। আশ্চর্য, এ বই-দুটিতে উৎপল সেই না-লেখার ভাষাসন্ধান করেন এবং লেখেন। প্রায় বছর আষ্টেক চষে-পাওয়া ফসলের ষোলো-দু-গুণে বত্রিশ পৃষ্ঠা শিল্প— কবির গত '৮০ সালে পোঁতা 'ধূসর আতাগাছ'-এরই এস্‌থেটিকস্‌-তাড়িত। পুরী সিরিজে এই এস্‌থেটিকস্‌ ছিল অনেক বেশি লিরিকাল। অধুনা-এর ঘরগেরস্থালি ও চামড়ার বদল হয়েছে— কিন্তু অন্তরাত্মা বিশেষ বদলায়নি। লিরিসিজম্‌ থেকে মুক্তিও তবে 'দু-হাত চার হাত'-এর মুক্ত পয়ার, যার পরতে-পরতে— আমরা এখনো যেটুকু পারছি— তা এই : (১) কবিতাকে মুখের ভাষার মধ্যে এনে বসানো, এবং (২) তারও গায়ের অলংকার আছে অনেক ; অবশ্য লেটেস্ট্‌ ডিজাইনের। (৩) রূপকাদির 'নতুন রূপ' নির্মাণ আর চিত্রকল্প ও প্রতীকের শর্ত অনুযায়ী ক্রমশ একটা এমন ভাষাস্পন্দ জাগানো, যেখানে প্রার্থিত হতে পারে, প্রকৃত অর্থেই, নিঃশ্বসিত গদ্য, অর্থাৎ প্রচলিত গদ্য-পদ্যের থেকে যতিবিচ্ছেদের চিরাবরহ। এজরা পাউন্ড্‌ যেমন ইমেজিস্টের কর্তব্যে চেয়েছিলেন ভাষার সেই রিদম্‌ তৈরি করে নিতে : 'to compose in the sequence of musical— phrase, not in the sequence of metronome'। আমাদের ইদানীংকার কাব্যভাষার তথাকথিত গদ্যগুণেও সেই সাংগীতিক পর্দাবিন্যাসের লঘুগুরুর স্বচ্ছন্দ সহাবস্থান— অবিকল এইরূপ :

ক. 'এই ঘাটে পরমার্থ সিঁড়ি
বহুদিন বাসন মেজেছি
বহুদিন কাপড় কেচেছি
নামিনি গভীরতর জলে
মনে ছিল ভয়, আজো আছে
আংটির গল্প-গেলা মাছে…'

('রক্ষাকবচ')

খ. 'ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত সঙ্গীতময় সরীসৃপ
আর দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূরে…'

('বৌভাত')

ভাষার absolute আর triviality পাশাপাশি থাকে তার উচ্চাবচ ধ্বনিতরঙ্গে, যেভাবে থাকলে— গানের কলিও সুরকে বাণীর প্রতীক হিসেবেই পায়। তা 'পরমার্থ সিঁড়ি' আর ঘাটের সে-সিঁড়িতে বসে 'বাসনমাজা' 'কাপড় কাচার' ধুমও আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে দুই মাত্রারই তফাৎ, কিন্তু দুই নয়, তিন মাত্রা। এক— পরমার্থে সিঁড়ি', দুই— 'বাসনমাজা কাপড়কাচা' এবং তিন— 'আংটির গল্প-গেলা মাছের' পুরাণ। পুরনো ঐতিহ্য, কর্মোদ্যম আর সমসাময়িকের উপার্জন, এই তিন মিলে যে ত্রিমাত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তাতেই ভাষানির্ভর বাস্তবতার 'খণ্ডবিশ্বাস' ও 'খণ্ডবৈচিত্র্যে'র একটা সমগ্র আদল আসে। তার জন্য ঘুমের নিশ্চেতনাকে— বোঝাপড়ার চেতনা-অবচেতনায় আনতে,

একমুখে 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত' ও 'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর প্রতীকভাষ্য-করা, আর অন্যমুখে— 'নিমন্ত্রণলিপি'র জাগর-অনুসন্ধিৎসায়, 'দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর'। একদিনকার গুরুচণ্ডাল—'শিবপোড়া মরাদাহ'-র বঙ্কিমী-শ্লেষ, কত-ভাবেই তা ব্যর্থ করে দিয়ে আজকের ভাষাবাস্তব আরো কত-কত প্রার্থিত ও সম্প্রসারিত, সে তথ্য উৎপলেরও মতো শব্দশিল্পী অবশ্যই জানেন।

কিন্তু লিরিসিজম্ থেকে, তার লিরিকাল প্রকট-অপ্রকট আবেগ থেকে, বাংলা কবিতায় দু-চার পঙক্তির 'মুক্তি' কদাচিৎ সম্ভব হলেও, সম্পূর্ণ কবিতার মুক্তি আজও সম্ভব হয়নি। অন্তত, উৎপলকুমার বসু তা পারেননি। আর, তা পারবেনই বা কেন। যদি তিনি জানেন, আবেগ কবিতাভাষার একটা মুভ্‌মেন্টও বটে, যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই আজও কবিকৃত্য। এই তাৎপর্যে, নিশ্চয় জ্ঞানবুদ্ধিমতে আবেগের যথাযথ সংস্থান ও প্রয়োগ-বিশেষত্বই শিল্পের প্রধান শর্ত।

অতএব, উৎপলেরই প্রতিভূ লোচনদাসের তথাকথিত কারিগরিটাই এ যুগের প্রধান শিল্প। সেখানে আবেগ ও বুদ্ধি উভয়তই সমীকৃত। সেখানে— বস্তুগত 'খণ্ডবিশ্বাস' একটি বিশেষ প্যাটার্ন :

> '...যখন ছিলাম পেটে জায়মান, ভ্রূণরূপী, অসত্য ছিল না
> খণ্ডবিশ্বাস ছিল, কাদা ছিল, ছিল বনে পায়ে হাঁটা পথ'
>
> ('প্রকৃতি')

আবার, প্যাটার্নটি ভেঙে ভেঙে এগোনোই এখনকার 'সাংবাদিকতার বোধ' থেকে ছাড়া-পাওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। 'কেননা প্রকৃত স্বপ্নের রূপ নেই, শুধু অবতংস আছে।' অর্থাৎ 'কারিগরি' স্বীকৃত।

তাহলে, এই চিত্রকল্প— 'যা ভাঙবার নয়, তা-ও টুকরো হয়' বলে কবিকে 'আলাদা যুদ্ধের গল্প' লেখার ইন্ধন জোগায়।

> '...ফুল হতে ঝরবার আগে
> যে-মাকড়লালাবিন্দু স্থির হয় শতাছিদ্র জালে
> স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির ভিতরে ক্রমশ তাকে টেনে নেয়
> প্রকৃতি ও আমাদের হুল
> সাংবাদিকতার বোধ।'...
>
> ('রক্ষাকবচ')

লক্ষণীয় যে 'সাংবাদিকতার বোধে' সে উর্ণাজাল আমাদের স্মৃতি থেকে ক্রমশ বিস্মৃতি-বিলগ্ন। যেমন, একই ভিতরটানে 'শান্তি' টানে যুদ্ধ, 'নালে পদ্ম টানে জল', এবং 'নৌকাটিকে টান দেয় বুঝমান ক্ষেত্রজ লোক'। বস্তু ও তার অন্যোন্যনির্ভর অনুষঙ্গধর্ম এই-সব টান ও টেনশনেরই বহু বিচ্ছুরিত রেখা। অধুনা লেখালেখির গোপন ইতিহাসে, কবি তাঁর 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন'-এ জানান :

'...আমি
হাড় হয়ে জন্ম নিতে চাই...'

('খলসামগ্রী)

এবং 'হাড়ে' যে মাংস লেগে থাকে, সে শুধু যেন তার 'শেষতম হাড়ে' পৌঁছবার জন্য। বস্তুর মৌলিক কাঠামো ঐ 'হাড়'। যাকে 'সময়গাছ' কবিতায় উৎপল বললেন 'করোটিপ্রতিমা'। কিন্তু এই প্রতিমারই জন্য যখন বলা হয়, '...নীল / ইস্পাতখণ্ড থেকে লাফ দিয়ে ওঠা / ধাতুকবিতার / শেষতম হাড়'— তখন, সে দৃশ্যকল্প ইমেজটি আগুন বা স্ফুলিঙ্গও বটে। আবার দধীচির হাড় দিয়ে বজ্রাস্ত্র-তৈরির পুরাণকল্পনাও, এ স্থলে, যেন কবিরই আত্মোৎসর্গপরায়ণ self-identification-এর তুল্য। অতএব আকেটাইপ। আগুনকে যেমন আমরা খেতে দিই, করোটিপ্রতিমার তেমনি চাই 'মাটি'। চাই 'খড়-অলঙ্কার'। তাকে মাটিচাপা 'অন্তরাল' থেকে টেনে বের করাই তাই কবিকৃত্য। কবির পুনরুদ্ধারও বটে। □